মৎস্য পক্ষ ২০০২

১০-২৪ আগস্ট

"দারিদ্র্যের অভিশাপ ঘুচাতে পারে মৎস্য চাষ"

মৎস্য অধিদপ্তর

মৎস্য ও পশুসম্পদ মন্ত্রণালয়

অঙ্গসজ্জা ও পরিকল্পনায় : ধারা এ্যাড

রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ

বাণী

বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম

প্রয়োজনীয় প্রাণীজ আমিষ সরবরাহসহ দেশের সামগ্রিক আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে মৎস্য সম্পদের অবদান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। নিঃসন্দেহে এটি একটি সম্ভাবনাময় সেক্টর।

সরকারী- বেসরকারী বিভিন্ন সংস্থার সমন্বিত কর্ম পরিকল্পনা, জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণ এবং লাগসই প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে সম্ভাবনাময় এ সেক্টরে কাঙ্খিত লক্ষ্য অর্জন করা সম্ভব। এর ফলে দেশের অভ্যন্তরীণ চাহিদা মিটিয়ে অতিরিক্ত মৎস্য ও মৎস্যজাত সামগ্রী বিদেশে রপ্তানী করা যায়। এ সেক্টরে কর্মসংস্থানের ব্যাপক সুযোগকে কাজে লাগানোর সুপরিকল্পিত উদ্যোগ একান্তভাবে প্রত্যাশিত। এ লক্ষ্যে মৎস্য পক্ষ উদযাপন কার্যক্রম অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে আমি মনে করি।

আমি মৎস্য পক্ষ ২০০২ এর সার্বিক সাফল্য কামনা করি।

(ব্যারিস্টার মুহম্মদ জমির উদ্দিন সরকার)

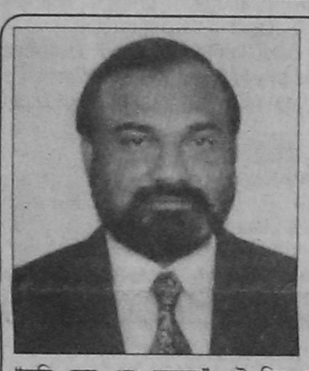

মন্ত্রী
মৎস্য ও পশুসম্পদ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

"জমি, জল এবং জনবল" এই তিন শ্রেষ্ঠ সম্পদের সার্বিক ও সমন্বিত ব্যবহারের উপরই কৃষি অর্থনীতি নির্ভর বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন নির্ভরশীল। "মাছে ভাতে বাঙালী" এই সনাতন প্রবাদবাক্য আমাদের জাতীয় ঐতিহ্য, বাংলাদেশী মূল্যবোধ, কৃষ্টি, সংস্কৃতির সাথে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। দেশের সামগ্রিক আর্থ-সামাজিক অগ্রগতি ও সমৃদ্ধি, আত্মকর্মসংস্থান, বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন এবং দারিদ্র বিমোচনে মৎস্য সম্পদের ভূমিকা অত্যন্ত-গুরুত্বপূর্ণ। মৎস্য চাষ, মৎস্য আহরণ ও প্রক্রিয়াজাতকরণ ইত্যাদি কার্যক্রম একটি স্বল্প শ্রম নির্ভর কিন্তু তুলনামূলকভাবে অধিক মুনাফা কেন্দ্রিক শিল্প।

অত্যন্ত উৎপাদনশীল অভ্যন্তরীণ জলজ সম্পদের পাশাপাশি আমাদের সামুদ্রিক জলজ সম্পদে রয়েছে উৎপাদনের অপরিসীম সুযোগ ও সম্ভাবনা। উন্নত চাষ পদ্ধতি, লাগসই প্রযুক্তি, টেকসই মৎস্য সংরক্ষণ ব্যবস্থাপনা, সহনশীল মৎস্য আহরণ নীতিমালা এবং কার্যকরী বিপণন ব্যবস্থা গড়ে তুলে গৃহীত কার্যক্রম বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ার সকল স্তরের জনগণের অংশীদারিত্ব এবং সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা গেলে মৎস্য সম্পদ উন্নয়ন এবং উৎপাদন কার্যক্রমকে অবশ্যই একটি সামাজিক আন্দোলনে পরিণত করা যাবে। সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলার পূর্ব শর্ত হচ্ছে এ বিষয়ে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করে ব্যাপকভাবে সচেতন এবং মৎস্য সম্পদ উন্নয়ন ও সংরক্ষণের প্রতি আন্তরিকভাবে সহনশীল হিসেবে গড়ে তোলা। জাতীয় মৎস্য পক্ষ ২০০২ এর আনুষ্ঠানিক উদযাপন কর্মসূচী ব্যাপক গণসচেতনতা গড়ে তোলার ক্ষেত্রে একটি কার্যকরী অবদান রাখবে বলে আমি মনে করি।

"দারিদ্রের অভিশাপ-ঘুচাতে পারে মৎস্য চাষ"- এ শ্লোগানকে সামনে রেখে মৎস্য পক্ষ ২০০২ এর সকল কার্যক্রমে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে অংশগ্রহণ করে রূপালী বিপ্লবের এ সামাজিক আন্দোলনকে ফলপ্রসু করে তোলার জন্য সর্বস্তরের জনগণের প্রতি উদাত্ত আহবান জানাই। মৎস্য পক্ষ ২০০২ এর সর্বাঙ্গীন সফলতা কামনা করি।

আল্লাহ হাফেজ
বাংলাদেশ জিন্দাবাদ

(সাদেক হোসেন খোকা)

মৎস্য খাতের সম্ভাবনা ও সম্পদ উন্নয়নের কলাকৌশল

মোঃ নাসির উদ্দিন আহমেদ
মহাপরিচালক
মৎস্য অধিদপ্তর

বাংলাদেশ একটি নদী বিধৌত ব-দ্বীপ। এদেশে রয়েছে অসংখ্য খাল-বিল, নদী-নালা, হাওড়-বাওড় ও উন্মুক্ত বা আধামুক্ত অভ্যন্তরীণ জলাশয় এবং বর্ষার মৌসুমী প্লাবন ভূমি। এছাড়া রয়েছে বঙ্গোপসাগরের বিশাল জলরাশি। এ সকল জলরাশি থেকে এক সময়ে নাম মাত্র শ্রম আর স্বল্প পুঁজিতে মাছ আহরণ করা যেত। কিন্তু জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে অবস্থার অনেক পরিবর্তন হয়েছে। এখন পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের ন্যায় আমাদেরকেও প্রযুক্তি ভিত্তিক উৎপাদন কার্যক্রম বাস্তবায়ন এবং মুক্ত জলাশয়ে বিজ্ঞান ভিত্তিক ব্যবস্থাপনার উপর অধিক গুরুত্ব দিতে হচ্ছে। এখনও আমাদের প্রাণিজ আমিষের দৈনন্দিন চাহিদার শতকরা ৬৩ ভাগ যোগান দিচ্ছে মাছ। অর্থনৈতিক উন্নয়ন, বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন এবং গ্রামীণ জনসাধারণের কর্মসংস্থানে এ সেক্টরের রয়েছে যথেষ্ট সুযোগ। এই সব সম্ভাবনাকে লক্ষ্য রেখে মৎস্য সেক্টরের ভবিষ্যৎ উন্নয়ন কলাকৌশল সরকার কর্তৃক নির্ধারণ করা হচ্ছে।

ষষ্ঠ পঞ্চম বার্ষিক পরিকল্পনার সমাপ্তি বৎসরে (২০০৬-২০০৭) মাছের মোট অনুমিত উৎপাদন ধরা হয়েছে ২৪.০৫ লক্ষ মেট্রিক টন। এ পরিকল্পনা মেয়াদে মাছের উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে, পুষ্টির অভাব দূরীকরণ, চাষী-জেলে মৎস্যজীবীসহ গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন, মৎস্য উৎপাদন শিল্পে অতিরিক্ত কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে দেশের দারিদ্র দূরীকরণে সহায়তা প্রদান, পরিবেশ ও জীববৈচিত্র সংরক্ষণ, মাছের আবাসস্থল উন্নয়ন ও অভয়াশ্রম স্থাপনসহ জলমহালের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করার কার্যকর উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। মৎস্যচাষ কার্যক্রমে মহিলাদের সম্পৃক্তকরণ, মৎস্য সম্পদের জৈবিক এবং প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন, চিংড়ি, মৎস্য এবং মৎস্যজাত পণ্যের রপ্তানী আয় বৃদ্ধি, গবেষণা, সম্প্রসারণ, ব্যবস্থাপনা ও সমন্বয় জোরদারের মাধ্যমে উদ্যোক্তাদের উৎসাহিতকরণ, দেশে উদ্ভাবিত বিদ্যমান প্রযুক্তি মাঠ পর্যায়ে হস্তান্তর এবং প্লাবনভূমির যথাযথ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে মৎস্য সম্পদ উন্নয়নের উদ্দেশ্য সাধনের ধারা অব্যাহত রাখার উপর জোর দেয়া হয়েছে। মৎস্য উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা এবং জাতীয় মৎস্য নীতির সাথে সামঞ্জস্য রেখে মৎস্য সম্পদের উন্নয়নের লক্ষ্যে এ খাতের উন্নয়ন কৌশলের সাথে মৎস্য অধিদপ্তর, মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট এবং বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন সম্পৃক্ত রয়েছে।

বদ্ধ ও মুক্ত জলাশয়ে মৎস্য ও চিংড়ি চাষ ব্যবস্থাপনার প্রযুক্তি উদ্ভাবন, সহনশীল মাত্রায় মৎস্য আহরণ, বিজ্ঞান ভিত্তিক ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট বিভিন্ন গবেষনা কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। এছাড়া দেশীয় বিলুপ্ত প্রায় মাছের প্রজনন, পোনা উৎপাদন ও চাষ প্রযুক্তি উদ্ভাবনে এবং ঝিনুক হতে বিশেষ প্রক্রিয়ায় মুক্তা চাষ ও মাছের উন্নত জেনেটিক জাত উদ্ভাবনের জন্য এ প্রতিষ্ঠান নিবিড় গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছে।

দেশের মৎস্য সম্পদের উন্নয়ন তথা সামুদ্রিক মৎস্য ক্ষেত্রে প্রযুক্তি হস্তান্তর ও ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম জোরদার করার লক্ষ্যে ১৯৬৬ সালে বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন প্রতিষ্ঠা লাভ করে। জন্মলগ্ন থেকে অদ্যাবধি এ প্রতিষ্ঠানটি বঙ্গোপসাগরে মৎস্য সম্পদের প্রাপ্যতা, আহরণের ক্ষেত্র, বাণিজ্যিক প্রজাতির মাছ ও চিংড়ি সনাক্তকরণসহ সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদের মৌলিক পরিসংখ্যান সংগ্রহের কাজ সম্পন্ন করার পাশাপাশি মৎস্য প্রক্রিয়াকরণ কার্যক্রমে ইতিবাচক পরিবর্তন সাধনের মাধ্যমে মৎস্য রপ্তানি, বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন, কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি, দারিদ্র বিমোচন ও দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে যথেষ্ট ভূমিকা রেখে আসছে।

বদ্ধ জলাশয় ঃ

দেশে চাষ উপযোগী প্রায় ২০ লক্ষ পুকুর-দীঘি রয়েছে যার আয়তন প্রায় ২.৭২ লক্ষ হেক্টর। তাছাড়া প্রায় ৬০০০ হেক্টর বাওড় রয়েছে। এতদভিন্ন অসংখ্য মৌসুমী জলাশয়, রাস্তা ও পার্শ্বস্থ ডোবা, জলাধার, বরোপিট, পাহাড়ী ক্রীক ইত্যাদি জলাভূমির আয়তন প্রায় ৫.৭ লক্ষ হেক্টর। যথাযথ উন্নয়ন পরিকল্পনা ও চাষ পদ্ধতির ব্যবস্থাপনা প্রযুক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে এ সকল জলাভূমিতে মৎস্য উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করা সম্ভব। উন্নয়ন কৌশল প্রয়োগের মাধ্যমে পুকুরের বর্তমান হেক্টর প্রতি বাৎসরিক গড় উৎপাদন ২.৫ মেট্রিক টন থেকে ৪ মেট্রিক টনে উন্নীত করা সম্ভব।

বহুমালিকানা, পুঁজি বিনিয়োগে অনীহার কারণে দেশের অনেক দীঘি-পুকুরে নাম মাত্র মাছ চাষ করা হয়। এছাড়া চাষী পর্যায়ে উপযুক্ত কারিগরি জ্ঞানের অভাবে লাগসই প্রযুক্তি ভিত্তিক মাছ চাষ কার্যক্রমের অভাবে জলাভূমিতে মৎস্য উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি হচ্ছে না। ব্যক্তি মালিকানাসহ দেশের সড়ক ও রেল লাইনের দুপাশে এবং বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও সেচ প্রকল্প এলাকায় অসংখ্য অপ্রচলিত/মৌসুমি জলাভূমি রয়েছে যা প্রয়োজনীয় অবকাঠামোগত উন্নয়নের অভাবে পতিত অবস্থায় পড়ে থাকায় এ সকল জলাভূমির মৎস্য উৎপাদনশীলতা অনেক কম। বন্যা নিয়ন্ত্রন ও সেচ প্রকল্প এলাকার জলাশয় উন্নয়নের মাধ্যমে মৎস্য ব্যাবস্থাপনা কার্যক্রম জোরদার করার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। দেশের অভ্যন্তরীণ জলাভূমির বর্তমানে চলমান মৎস্য ব্যবস্থাপনাকে আরও উন্নীত করে এর মৎস্য সম্পদের জৈবিক পরিচর্যার প্রতি খেয়াল রাখলে দেশে মৎস্য উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পাবে।

একবিংশ শতাব্দির সূচনালগ্নে "মাছে ভাতে বাঙ্গালী" প্রবাদটিকে বাস্তবে রূপদান করার লক্ষ্যে বাস্তব ভিত্তিক পরিকল্পনার মাধ্যমে এ খাতের উন্নয়ন কৌশল অবলম্বন করা হচ্ছে। জাতীয় মৎস্যনীতির আলোকে দেশের মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি, সম্প্রসারণ কার্যক্রম ত্বরান্বিত করণ তথা সার্বিক ব্যবস্থাপনা মানউন্নয়নের লক্ষ্যে "জাতীয় মৎস্য সম্প্রসারণ কর্মকৌশল" প্রণয়নের কাজ প্রায় শেষ পর্যায়ে রয়েছে। এ কর্মকৌশল বাস্তবায়ন করা হলে মৎস্য অধিদপ্তরের পাশাপাশি অন্যান্য সহযোগী সংস্থা/প্রতিষ্ঠানের সাথে সংযোগ স্থাপন, সম্প্রসারণ সার্ভিসের প্রয়োজনীয় বিকেন্দ্রীকরণ, যুগোপযোগী সম্প্রসারণ পদ্ধতির যথাযথ প্রয়োগ, পরিবেশ সহনশীল প্রযুক্তি হস্তান্তর ও ব্যবস্থাপনা জোরদারকরণ, মানবসম্পদ উন্নয়ন, সবোপরি সকল কার্যক্রমে জনগণের কার্যকর অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি করা সম্ভব হবে। দেশে চাষযোগ্য পোল্ডার/এনক্লোজার, বিল, ধানীজমি, উপকূলীয় ঘের এবং মিঠাপানির বদ্ধ জলাভূমির পরিমাণ প্রায় ১৪.৫১ লক্ষ হেক্টর। এসব জলাভূমির বর্তমান হেক্টর প্রতি উৎপাদন গড়ে প্রায় ৫০৫ কেজি, যা ধানক্ষেতে মাছ চাষ, রুই জাতিয় মাছের মিশ্র চাষ, রুই জাতিয় মাছের সাথে পাঙ্গাসের মিশ্র চাষ, মৌসুমী পুকুরে রাজপুটির চাষ, গিফট জাতের তেলাপিয়ার চাষ এবং পেনে মাছ চাষ ইত্যাদি প্রয়োগের মাধ্যমে করা সম্ভব। বর্তমান সীমিত সুযোগ-সুবিধার মাধ্যমে এ সকল প্রযুক্তির যথাযথ প্রয়োগে চাষী পর্যায়ে বর্তমান হেক্টর প্রতি গড় উৎপাদন ৯৩৫ কেজির স্থলে ২৪৬২ কেজি করা সম্ভব হয়েছে। সম্প্রসারণ কার্যক্রম আরও বেগবান করার লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট মৎস্য চাষী/উদ্যোক্তাকে গুণগত মানের বিভিন্ন প্রজাতির পোনা প্রাপ্তির নিশ্চয়তা প্রদান, ইউনিয়ন পর্যায়ে নার্সারী স্থাপন, প্রশিক্ষণ ও প্রদর্শনী খামার পরিচালনা এবং আগ্রহী/সম্পৃক্ত সুফলভোগীদের সহজ উপায়ে মৎস্য ঋণ প্রাপ্তির ব্যবস্থা করার পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে।

মুক্ত জলাশয় ঃ

ভৌগলিক দিক দিয়ে বিবেচনা করলে এ দেশকে মাছের দেশ বলা যায়। অতীতে মুক্ত জলাশয় থেকে সিংহভাগ মাছ আহরণ হতো। নদ-নদী, খাল-বিল, হাওর-বাওর, সুন্দরবন ও মোহনা অঞ্চল, কাপ্তাই হ্রদ ও প্লাবনভূমি মিলে দেশের প্রায় ৪৯.২০ লক্ষ হেক্টর অভ্যন্তরীন মুক্ত জলাশয়ে বিদ্যমান সমস্যা ও প্রতিবন্ধকতার উত্তোরণ ঘটিয়ে সঠিক উন্নয়ন কৌশলের মাধ্যমে এ খাত থেকে আরও অনেক বেশী মাছ উৎপাদনের ব্যবস্থা করা সম্ভব।

বদ্ধ জলাশয়ে মৎস্য উৎপাদনের উর্দ্ধগতি লক্ষ্য করা গেলেও নানাবিধ সমস্যা ও প্রতিবন্ধকতা এবং উৎপাদন ভিত্তিক জৈবিক ব্যবস্থাপনার অভাবে দেশের অভ্যন্তরীণ মুক্ত জলাশয়ে মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধির প্রবণতা আশানুরূপ নয়। বর্তমানের রাজস্ব ভিত্তিক ইজারা ব্যবস্থাপনায় ইজারা গ্রহীতার অধিক লাভের আশায় জলমহাল হতে নির্বিচারে মৎস্য আহরণ, জলাশয় সেচে সম্পূণরূপে মাছ ধরে ফেলা, জলমহালের মৎস্য প্রজনন ক্ষেত্র সংরক্ষণ না করা, ডিম ওয়ালা ও পোনা মাছ নিধন, মাছের বিচরণ ক্ষেত্রের ক্ষতি সাধনসহ নানাবিধ ক্ষতিকারক কার্যক্রম গ্রহণে জলমহালে উৎপাদন বৃদ্ধির স্বাভাবিক ধারা ব্যহত হচ্ছে।

তাছাড়া বিভিন্ন সরকারী/আধা-সরকারী/বেসরকারী সংস্থা/প্রতিষ্ঠানের অপরিকল্পিত ও সমন্বয়হীন উন্নয়ন মূলক কার্যক্রম যেমন- কৃষি কাজে সেচের জন্য অতিরিক্ত পানি নিষ্কাশনে মাছের স্বাভাবিক জীবন প্রণালী ব্যহত, বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ এবং সড়ক ও রাস্তাঘাট নির্মাণের প্রাক্কালে যথাযথভাবে ফিস পাস নির্মাণের অভাবে মাছের বিচরণ, প্রজনন ও শুষ্ক মৌসুমে প্লাবনভূমি থেকে মুক্ত জলাশয়ে যাতায়াতে বাধাগ্রস্ত হওয়া, কলকারখানা, শিল্প প্রতিষ্ঠান, নগর ও শহর এলাকার বর্জ্য পদার্থের দ্বারা জলাশয় দূষণে মাছের প্রজনন ক্ষেত্র বিনষ্টসহ মাছের স্বাভাবিক জীবন যাত্রায় পরিবেশগত বিপর্যয়ে মুক্ত জলাশয়ের মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি ব্যহত হচ্ছে। এছাড়া বন্যা নিয়ন্ত্রণ এবং সেচ প্রকল্পের প্রয়োজনে বিভিন্ন অবকাঠামো নির্মাণ, প্রাকৃতিক পরিবেশ ও মনুষ্য সৃষ্টি বিবিধ প্রতিকূল পরিবেশ, প্রতিবেশী দেশ কর্তৃক উজানে বাঁধ দেয়া ইত্যাদি কারণে জলমহালে অতিরিক্ত পলি পড়ে মাছের আবাসস্থলের ক্ষতি, মাছের স্বাভাবিক উৎপাদন বজায় রাখতে প্রয়োজনীয় অভয়াশ্রম না থাকা, জনসংখ্যা বৃদ্ধি জনিত কারণে মৎস্য আহরণ চাপ বেশী হওয়া ইত্যাদি কারণে জলমহালে মাছের উৎপাদনশীলতা হ্রাস পাচ্ছে। অধিকন্তু কারেন্ট জাল উৎপাদন, বিপনন ও ব্যবহারের ফলে মৎস্য ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। মাঠ পর্যায়ে পর্যাপ্ত জনবলের অভাবে প্রযুক্তি ভিত্তিক জৈবিক মৎস্য ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম পরিচালনা ও বাস্তবায়ন এবং মৎস্য চাষ ব্যবস্থাপনার সম্প্রসারণ সেবা প্রদান ইত্যাদি কার্যক্রম দ্রুত জনগণের নিকট পৌছানো কঠিন হচ্ছে। সর্বোপরী জলমহালে মৎস্য ব্যবস্থাপনার সার্বিক প্রশাসনিক কর্তৃত্ব একই ব্যবস্থাপনার হাতে অর্পিত না হওয়ায় মৎস্য সেক্টরের জলমহাল ব্যবস্থাপনায় কোন স্থিতিশীল ব্যবস্থাপনা গড়ে উঠেনি বিধায় মৎস্য সম্পদ সংরক্ষণ ও উৎপাদন বদ্ধির প্রতিবন্ধকতা লেগেই আছে। এ সকল সমস্যা সমাধানের মাধ্যমে উৎপাদন বৃদ্ধির বিষয়টি সরকারের সক্রিয় বিবেচনাধীন আছে।

বিগত দিনের অভ্যন্তরীণ মুক্ত জলমহাল ব্যবস্থাপনার অভিজ্ঞতা এবং জলমহালের প্রাকৃতিক ও ভৌতিক বৈশিষ্ট্য সমূহ বিবেচনা ছাড়া এ খাতের উন্নয়ন কৌশল নির্ধারণের কোন বিকল্প নেই। অমৎস্যজীবী, প্রভাবশালী ও ক্ষমতাবান ইজারাদার ও বহিরাগত ব্যক্তিদের জলমহালের উপর একচ্ছত্র আধিপত্য বিস্তার রোধ করে গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠিসহ প্রতৃতি মৎস্যজীবী/মৎস্য চাষী/উদ্যোক্তাদের অংশীদারিত্বমূলক অংশ গ্রহণের মাধ্যমে জলমহালের মৎস্য ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন কার্যক্রমে মৎস্য সম্পদের টেকসই ব্যবহার নিশ্চিত হলে রপ্তানী/রাজস্ব আয় বৃদ্ধি পাবে, কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে, সুফলভোগীদের ক্ষমতায়ন বৃদ্ধি পাবে, সুষম বন্টন নিশ্চিত হবে এবং এ খাতের সম্পৃক্ততায় দেশের দারিদ্র বিমোচন বহুলাংশে লাঘব হবে।

বন্য নিয়ন্ত্রণ এবং কৃষি কার্যের প্রয়োজনে সেচ প্রকল্পভূক্ত এলাকায় বাঁধ ও রাস্তাঘাট নির্মাণের প্রাক্কালে মৎস্য সম্পদের বিকল্প জলাধার সৃষ্টি ও ফিস পাস নির্মাণের ব্যবস্থাকরণ, বর্তমানে বিদ্যমান এ সকল প্রকল্প এলাকায় প্রয়োজনানুযায়ী ফিস পাস ও মাছ চাষের বিকল্প ব্যবস্থা গ্রহণ; বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধের ভিতরের এলাকাসহ সুবিধাজনক যে কোন ধান চাষ এলাকায় বাড়তি ফসল হিসেবে মাছ উৎপাদনের জন্য ধানক্ষেতে মাছ চাষের কার্যক্রম গ্রহণ; প্রজননক্ষম মাছের মজুদ বৃদ্ধি এবং বিলুপ্ত প্রায় প্রজাতি রক্ষার্থে রুই, পাঙ্গাস, ইলিশ জাতিয় মাছসহ অন্যান্য মাছ জলমহালের যে অংশে প্রাকৃতিকভাবে প্রজনন করে, সে অংশ/স্থানকে চিহ্নিত করে সুফলভোগী জনগোষ্ঠির সম্পৃক্ততায় সরকারী/বেসরকারীভাবে মৎস্য অভয়াশ্রম স্থাপন; সুফলভোগীদের অংশীদারিত্ব মূলক অংশ গ্রহণের ভিত্তিতে সরকারী/বেসরকারী পর্যায়ে পোনামাছ অবমুক্তকরণ; বেসরকারী সংস্থা এবং সামাজিক বিভিন্ন সংস্থার সহায়তায় সুফলভোগীদের সংগঠিত করে সমাজ ভিত্তিক মৎস্য ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমের সম্প্রসারণ; আহরণ চাপ নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে মৎস্য আহরণে ব্যবহৃত জাল ও সুফলভোগীদের সংখ্যা নিয়ন্ত্রণ এবং অতিরিক্ত পলি পড়ে যে সকল মুক্ত জলমহালে মাছের আবাসস্থল সংকুচিত হয়ে মাছের স্বাভাবিক জীবনপ্রণালীর উপর প্রতিকূল পরিবেশের সৃষ্টিসহ বংশ বিস্তারের উপর বিরূপ প্রভাব পড়েছে, সে সকল জলমহাল চিহ্নিত পূর্বক ঐ সকল জলমহালে মাছের আবাসস্থল উন্নয়ন (সংস্কার) কৌশল অবলম্বনে মুক্ত জলমহালের বর্তমান উৎপাদন হার বৃদ্ধির পরীক্ষামূলক কাজ বাস্তবায়নাধীন আছে।

তাছাড়া জৈবিক মৎস্য ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমের আওতায় উৎপাদন পরিকল্পনার ভিত্তিতে দীর্ঘ মেয়াদে জলমহাল ইজারা প্রদান ও উৎপাদন বৃদ্ধির স্বার্থে জলমহালের ভৌতিক ও পরিবেশগত বৈশিষ্ট্যের আলোকে ইজারামূল্য স্তিতিশীল রাখা/ নির্ধারণ করা; হিলসা (ইলিশ) মৎস্য সম্পদ সংরক্ষণ ও উন্নয়নের জন্য জৈবিক কার্যক্রম গ্রহণ, মৎস্য সংরক্ষণ আইনের যথাযথ বাস্তবায়নের সুফল সম্বন্ধে সুফলভোগী/ইজারা গ্রহনকারীদের উদ্বুদ্ধকরণে জোরালো পদক্ষেপ গ্রহণে এ খাতের উৎপাদন ও আয় বহুলাংশে বৃদ্ধি পাবে। স্থিতিশীল মৎস্য ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে জলমহাল মৎস্য ও পশুসম্পদ মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনার আওতায় থাকলে মন্ত্রণালয় দেশের মৎস্য বিজ্ঞানী ও বিশেষজ্ঞদের চিন্তা-চেতনা সমন্বয়ে এ খাতের সমন্বিত উন্নয়ন কৌশল প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে আরও অগণী ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে।

উপকূলীয় জলাভূমি ঃ

এ দেশের উপকূলীয় অঞ্চলের জলাভূমি চিংড়ি চাষ ব্যবস্থাপনার জন্য খুবই উপযোগী। প্রাথমিক পর্যায়ে সনাতনী পদ্ধতিতে চাষ হলেও পরবর্তী পর্যায়ে উন্নত পদ্ধতিতে এর চাষ ব্যবস্থাপনা সম্প্রসারিত হয়। উপকূলীয় অঞ্চলে চিংড়ি চাষভূক্ত জমির পরিমাণ প্রায় ১.৪১ লক্ষ হেক্টর। এ সকল জলাভূমিতে আধা-নিবিড় পদ্ধতিতে চিংড়ি চাষে হেক্টর প্রতি চিংড়ি উৎপাদনের বর্তমান গড় হার প্রায় ৩০০-৪০০ কেজির স্থলে বহুগুণ বৃদ্ধি করা সম্ভব। ২০০০-২০০১ সালে ২৯৭১৩ মেট্রিক টন বাগদা এবং গলদা জাতিয় চিংড়ি রপ্তানী করে দেশের ২০১০.০০ কোটি টাকা আয় হয়েছে। উপকূলীয় অঞ্চলে চিংড়ি সম্পদ উন্নয়ন এবং বিভিন্ন প্রজাতির মাছ চাষ ব্যবস্থাপনার উন্নয়নে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন ছাড়াও কর্মসংস্থান সৃষ্টির যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে।

অর্থনীতির বিচারে চিংড়ির ভূমিকা তরল সোনা বা পেট্রোলিয়ামের সঙ্গে তুলনীয়। তবে তেল-গ্যাস বা শিলা যেখানে শুধুমাত্র আহরনেই সোনা হয়ে যায়, চিংড়ির জন্য সেখানে প্রয়োজন উপযুক্ত পরিবেশ। চিংড়ি চাষের সম্প্রসারণ এবং চিংড়ি উৎপাদন বৃদ্ধির কর্মকান্ডের সাথে দেশের দারিদ্র বিমোচন, কর্মসংস্থান এবং রপ্তানী আয়ের প্রসঙ্গ জড়িত বিধায় এ খাত আজ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় অবতীর্ণ। এ খাতের বিদ্যমান নানাবিধ সামাজিক ও উন্নয়ন সমস্যার দিকগুলো চিহ্নিত করে তা সমাধানের জন্য উন্নয়ন কৌশল প্রয়োগে এ খাত হতে পারে দেশের অর্থনীতির জন্য এক লোভনীয় ও আকর্ষণীয় দিক। অসামঞ্জস্যপূর্ণ ঘের, খামারের আয়তন ও অবকাঠামোগত সুযোগ-সুবিধার অভাব, লাগসই প্রযুক্তি নির্ভর কারিগরী জ্ঞানের অভাবে অনুপযুক্ত স্থানে ও অপরিকল্পিত উপায়ে চিংড়ি চাষের প্রসার, উপযুক্ত/ মৌসুমী সময়ে চিংড়ি পোনার অপর্যাপ্ত সরবরাহ, চিংড়ির রোগ নিরাময়/নির্ণয়ে গবেষণাগার/স্বাস্থ্য পরীক্ষাগার না থাকা, চাষী পর্যায়ে অধিক লাভের আশায় কোনরূপ পূর্বপ্রস্তুতি ও অভিজ্ঞতা ছাড়াই চিংড়ি চাষ শুরু করার প্রবণতা এবং অধিক ঘনত্বে পোনা মজুদসহ চাষ ব্যবস্থাপনায় সনাতনী ধ্যান-ধারণা অবলম্বন করা, চিংড়ির খামারী/ঘেরের নিক্ষিপ্ত বর্জ্যে পরিবেশের ক্ষতি সাধন, চিংড়ি চাষের সম্ভাবনাপূর্ণ এলাকায় কার্যকরী সুষ্ঠু পরিকল্পনার অভাব ইত্যাদি সমস্যা জনিত কারণে এ খাতের আরও অধিক অর্থনৈতিক অর্জন সংহত হচ্ছে না।

বিশ্ব বাজারে চিংড়ি খাদ্য হিসেবে এক লোভনীয় ও আকর্ষণীয় সামগ্রী। স্বাদ ও পুষ্টির কারণে বিশ্বে এর চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়া এবং আন্তর্জাতিক বাজারে মূল্য অধিক হওয়ায় দেশে চিংড়ি এক বিরাট শিল্পরূপে পরিচিতি পেয়েছে। চিংড়ি শিল্পের সাথে জড়িত রয়েছে লক্ষ লক্ষ নারী পরুষের বাঁচার অধিকার। গ্রামীণ বিশেষ করে উপকূলীয় গ্রামীন এলাকার জনগোষ্ঠির কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে এবং দেশের রপ্তানী আয় বৃদ্ধিতে চিংড়ি সম্পদ দেশের জন্য বড় ধরণের উত্তোরণ ঘটাতে পারে। এ শিল্পের উন্নয়নের জন্য বর্তমানে দুইটি উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

উপকূলীয় জলাভূমির যে জমিতে চিংড়ি চাষ হবে, সে জমিতে ধান কিংবা অন্য ফসল ভাল হবে না বিধায় সে জমি চিংড়ি চাষের জন্য নির্দিষ্ট রাখাই উত্তম। সে লক্ষ্যে উপকূলীয় ভূমি ব্যবহার নীতিমালা প্রণয়ন পূর্বক ভূমির শ্রেণীবিন্যাস করে উক্ত ভূমিতে স্থানীয় সুযোগ-সুবিধা ও পরিবেশ সহনীয় লাগসই চিংড়ি চাষ ব্যবস্থাপনার সম্প্রসারণ, চিংড়ি চাষের উপযুক্ত পানির নদীর পাশের একটা নির্দিষ্ট এলাকাকে চিংড়ি চাষ জোন হিসেবে ঘোষণা করে বেসরকারী উদ্যোক্তাদের সম্পৃক্ততায় চিংড়ি চাষের জন্য এর অবকাঠামোগত উন্নয়ন (জমির মালিকানা বহাল রেখে), পরিবেশ অনুকূল ঝুঁকিমুক্ত আধা-নিবিড় চিংড়ি চাষ প্রসারের জন্য উদ্যোক্তাদের উদ্বুদ্ধকরণ, উপযুক্ত জলাভূমিতে চিংড়ির পর কৃষি ফসলের উৎপাদন আবর্তক চিংড়ি চাষ পদ্ধতির প্রচলন, উপযুক্ত/মৌসুম সময়ে সুস্থ সবল চিংড়ি পোনা সরবরাহ, চিংড়ি পোনার মৃত্যুহার হ্রাসের জন্য বিমান এবং অন্যান্য উপযোগী পরিবহন ব্যবস্থার সুযোগ সৃষ্টি, চিংড়ি খামার/ঘেরে পানি সরবরাহ ও নিষ্কাশন, বিদ্যুৎ ব্যবস্থা ও অন্যান্য আনুসাঙ্গিক অবকাঠামোগত সুযোগ-সুবিধার জন্য উদ্যোক্তাদের সহজশর্ত